অন্তঃসৌন্দর্য

দার্শনিক বলো, বৈজ্ঞানিক বলো, ধার্মিক বলো, শিল্পী বলো, সকলের মনে এই একই ভাবনা যে সত্যকে দেখতে হবে, ছুঁতে হবে, ধরতে হবে, পেতে হবে, দিতে হবে। এ ভাবনা যার নেই সে দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক নয়, ধার্মিক বা শিল্পী নয়। যাদৃশী ভাবনা তাদৃশী সিদ্ধি। সত্যকে যারা চায় সত্য তাদের নিরাশ করে না।

কিন্তু শিল্পীর ভাবনা কেবল সত্যের ভাবনা নয়। সৌন্দর্যের ভাবনাও বটে। এ ভাবনা দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ধার্মিককে কাঁদায় না, কাঁদালে কাঁদায় মরমীকে মিস্টিককে। অথচ শিল্পীমাত্রেরই এ কাঁদন কপালে লেখা। সৌন্দর্য বিশেষ করে শিল্পীরই দায়। শিল্পী, অথচ সৌন্দর্যের দায় নেই, এমনটি দেখা যায় না। সমাজের দায় নিয়ে যারা কাতর তাদেরও কি সৌন্দর্যের দায় নেই? হয়তো গৌণ, তবু আছে। না থাকলে তাদের শিল্পী না বলাই সঙ্গত। শিল্প তাদের কাছে সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তমাত্র।

সত্য আর সৌন্দর্য এ দুটির একটি বেছে নিতে বললে শিল্পী বেছে নেবে সৌন্দর্য। দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ধার্মিক বেছে নেবে সত্য। তবে ধার্মিকের পক্ষে বেছে নেওয়া শক্ত। সত্য আর সৌন্দর্য এ দুটির দ্বিতীয়টি না থাকলে দর্শনের চলে, বিজ্ঞানের চলে, ধর্মেরও হয়তো চলে, কিন্তু শিল্পের বেলা অচল। অবশ্য বেছে নিতে কেউ বলেও না, কেউ চায়ও না। শিল্পের রাজ্যে সত্য ও সৌন্দর্য উভয়ের সমান গুরুত্ব। অন্তত উনিশ বিশ।

সৃষ্টি যদি সত্যের শৈলের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে তা অচিরস্থায়ী। নিছক সৌন্দর্যের সাহায্যে কালজয়ী হওয়া যায় না। সৌন্দর্যকে তার জন্যে সত্যের মুখাপেক্ষী হতে হবে। কিংবা হতে হবে সত্যের সমার্থক। কিটসের ভাষায়। শিল্পীকে ভাবতে হবে সত্যের ভাবনা, তথা সৌন্দর্যের ভাবনা। একাধারে উভয়ের। সত্যকে গৌণ করা চলবে না। সৌন্দর্যকে মুখ্য না করাও চলবে না। চলতে পারে উভয়ের উনিশ বিশ।

শিল্পীরা মনে মনে এর একটা নিষ্পত্তি করে নেয়। সত্য বলে, সুন্দর করে বলে। বলার ভঙ্গি বা পদ্ধতি বা ঢং বা ঠাট বা ধরনটা সুন্দর। শৈলী সুন্দর। আঙ্গিক সুন্দর। অলঙ্কার সুন্দর। রূপ সুন্দর। কিন্তু বলার কথাটা হয়তো অসুন্দর। অসুন্দর সত্য। বিষয়টা হয়তো সৌন্দর্যবিরহিত। অথচ সত্যসমন্বিত। শিল্পীরা সত্যের সঙ্গে অসুন্দরকে জুড়ে তার উপর কারিগরি ফলিয়ে তাকে সুন্দর করে তোলে। মনে করে বহিঃসৌন্দর্যই যথেষ্ট।

কিন্তু বহিঃসৌন্দর্যই যথেষ্ট নয়। ভিতরে থাকবে সুন্দর মন সুন্দর আত্মা। অন্তঃসৌন্দর্য। অসংখ্য তথ্য পরিবৃত হয়ে আমাদের জীবনযাত্রা। কোথায় তার অন্তর্নিহিত সত্য তার উপর যদি হাতের মুঠো শক্ত হয় তবেই সার্থকতা। এক হাতের মুঠো। আরেক হাতের মুঠো শক্ত হবে যার উপর তার নাম অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য। সৃষ্টির বাইরেটা যদি সুন্দর নাও হয় তবু তার অন্তঃসৌন্দর্য তার ভিতর থেকে ফুটে বেরোবে।

জীবনকে কেউ কোনোদিন সরল করতে পারেনি। বড়ো জোর আপনার জীবনযাত্রাকে সরলতর করতে গিয়ে সাধুসন্ন্যাসীর মতো হয়েছে। জীবন চিরদিন জটিল ছিল, জটিলই থাকবে চিরদিন। সেই জটিলতার গ্লানি মোচন করে উদ্ধার করতে হবে প্রকৃত সত্য। তেমনি আবিলতার ভিতর থেকে অনাবিল সৌন্দর্য। যার দুই হাত এই নিয়ে ব্যাপৃত তার সাধনা সংসারী যা সন্ন্যাসী কারো সঙ্গে মিলবে না। শিল্পীকে তার আপনার মতো করে বাঁচতে দিতে হবে, নইলে মানুষটা হয়তো বাঁচবে, কিন্তু তার শিল্পীত্ব হয়তো বাঁচবে না। শিল্পকে মূল্য দিলে শিল্পীপ্রকৃতিকেও মূল্য দিতে হয়।

অপরে যা এড়াতে পারে শিল্পী তা এড়াতে পারে না। তাকে পাঁকে নামতে হয়, খাদে নামতে হয়। এমন সব লোকের সঙ্গে মিলতে ও মিশতে হয় যারা পাপী আর দাগী আর পতিত আর পীড়িত। লাইব্রেরি বা ল্যাবরেটরিতে বসে, মঠে বা মন্দিরে বসে শিল্পী তার সত্যের সাক্ষাৎ চায় না কিংবা পায় না। কখনো সে যুদ্ধবিগ্রহের রক্ততরল আবর্তে খড়কুটোর মতো অসহায়, কখনো হাসপাতালে যমে মানুষে টানাটানির নীরব সাক্ষী। কখনো ধূর্ত শৃগালদের বেচাকেনার বাজারে হাজির, কখনো ফন্দিবাজ পায়রাদের পলিটিকসের আসরে উপস্থিত। উৎসবে ব্যসনে রাজদ্বারে শ্মশানে কোথাও সে অনধিকারী বা অশোভন নয়। যেখানেই মানুষ সেখানেই শিল্পী।

আবার যেখানে জনমানব নেই, আছে কেবল প্রকৃতি, সেখানেও শিল্পী আছে তার সত্যজিজ্ঞাসা নিয়ে, তার সৌন্দর্যতৃষ্ণা নিয়ে। সেখানেও সে একা নয়, প্রকৃতি তার সঙ্গিনী। সঙ্গিনী কখনো দক্ষিণা, কখনো করালী। কিন্তু প্রতিদিন বিচিত্ররূপিণী। শিল্পী যদি মানুষকে এড়ায়, প্রকৃতিকে না এড়ায়, তা হলেও তার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ভরে ওঠে। আর যদি প্রকৃতিকেও এড়ায়, অন্তর্জীবনের রহস্য ভেদ করতে এক কোণে বসে যদি ধ্যান করে তা হলেও তার উপলব্ধি সুপ্রচুর হতে পারে।

অজস্র অভিজ্ঞতা অসীম উপলব্ধি ক্রমে শিল্পে রূপান্তরিত হয়। যখন হয় তখন তার মূল্য নির্ধারণ করা হয় তার অন্তর্নিহিত সত্য দিয়ে, অন্তঃসৌন্দর্য দিয়ে। কেবল একরাশ তথ্য থাকলেই চলবে না, কেবল মনোজ্ঞ ভঙ্গি বা মনোহর শব্দবিন্যাস থাকলেই চলবে না, আরো গভীরে যেতে হবে সত্যের উপলব্ধি করতে ও করাতে, আরো আড়ালে যেতে হবে সৌন্দর্যের অবগুণ্ঠন খুলে দেখতে ও দেখাতে। তথ্যের অরণ্যের ভিতরে সত্যের সাক্ষাৎ। এমন দৃষ্টি চাই যা সব ছদ্মবেশের অন্তরালে সত্যকে দেখতে পায়। চিনতে পারে। তেমনি সৌন্দর্যকেও।

অন্তর্নিহিত সত্য কেবল বস্তুগত নয়। মুখ দেখে মানুষ চেনা যায় না। তবে কি তা ব্যবহারগত? না, কেবল তাও নয়। কাছ থেকেও চেনা যায় না মানুষকে। বস্তুর সঙ্গে একাত্ম হতে হয়, আপনাকে মিলিয়ে দিতে হয়, বিলীন করে দিতে হয়। তবেই চেনা যায় তাকে, চেনা যায় মানুষকে। তেমনি অন্তঃসৌন্দর্য কেবল সুন্দর ভাষা বা ছন্দ নয়, আঙ্গিক বা অলঙ্কার নয়। তাদের যা সৌন্দর্য তা অন্তঃসৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ হতেও পারে, না হতেও পারে। যদি হয় তবেই তারা অনির্বচনীয় ব্যঞ্জনাময়।

রূপমাত্রেরই বিকার ঘটে, তা বাসি হয়ে যায়, ম্লান হয়ে যায়, শুকিয়ে ঝরে পড়ে। কিন্তু যেখানে অন্তঃসৌন্দর্য বিকশিত হয়েছে সেখানে রূপ আর শুধু রূপ নয়, তার চেয়ে বেশি। সে ফুল শুকিয়ে ঝরে পড়বার মতো নয়, সে চিরমন্দার। তেমন রূপের জন্যে প্রসাধনের দরকার হয় না। অবশ্য প্রসাধনেরও একটা মূল্য আছে। তাতে রূপ আরো

খোলে। কিন্তু যেখানে অন্তঃসৌন্দর্যেরই অভাব সেখানে প্রসাধনের যাদুকরী সাধারণের মনোহরণ করতে পারলেও মহাকালের মনোহরণে অক্ষম।

সমস্ত প্রতিবাদসত্ত্বেও এই জগতের অন্তর সৌন্দর্য দিয়ে ভরা। সেই অব্যক্ত সৌন্দর্যই রূপে রূপে ব্যক্ত হচ্ছে। রূপ ফুরিয়ে গেলেও সৌন্দর্য ফুরিয়ে যাচ্ছে না। সে নিয়ত পূর্ণ। পূর্ণতা থেকে আসছে তার বিচিত্র প্রকাশ। যেন পূর্ণতার ফোয়ারা থেকে উপচে ওঠা রস। যা সুন্দর নয় তাকেও সে সৌন্দর্যের রসায়নে রূপান্তরিত করে। অসুন্দরের উপর সুন্দরের প্রভাব পড়ে। সুন্দরেরই ক্ষমতা বেশি।

এ জগতে অসুন্দর আগে। কোনো সন্দেহ নেই তাতে। কিন্তু আর্ট এই অবধি এসে থেমে যায় না। সে যখন এর থেকে কিছুদূর এগিয়ে যায় তখন তার সঙ্গে চলতে চলতে অসুন্দরও সুন্দর হয়ে যায়। বিজ্ঞানীর কাছে যেটা তথ্য শিল্পীর কাছে সেটা উপাদান। উপাদানকে সুন্দরের প্রভাবে সুন্দর করে তোলা যায়। তখন অসুন্দরের তুলনায় সুন্দরের সীমানা বেড়ে যায়। বলা বাহুল্য বস্তুগত কোনো পরিবর্তনের কথা হচ্ছে না। বস্তু যেখানকার সেখানে সে অসুন্দর হতে পারে, কিন্তু আর্টের উপাদান হয়ে চিত্রের বা ভাস্কর্যের বা কাব্যের বা নাট্যের সামিল হলে তারপর সে সুন্দর হয়ে ওঠে।

(১৯৬৫)